

যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ যুবক ও অন্ধ-গোঁড়ামি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইয়ী

যুবক ও অন্ধ-গোঁড়ামি - ২

আবুল কাসেম (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিস্তাবর্গ অভিষাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।” (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) (মুসলিম ২৬১৬নং) কথিত আছে যে, “একদা লুকমান হাকীম তার পুত্রকে বললেন, বৎস! যারা বলে, মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করা উত্তম পন্থা” তারা মিথ্যা ও ভুল বলে। আর যদি তারা এ কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে পাশাপাশি দু’টি আগুন জ্বালিয়ে দেখুক না; একটি আগুন অপর আগুনকে নিভাতে পারে কি না?”

অতএব সত্য ও বাস্তব এই যে, মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করা যায়; যেমন আগুনকে নিভানো যায় পানি দ্বারা। পেশাব দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার হলেও নাপাকী যায় না, প্রয়োজন হয় পবিত্র পানির। বলা বাহুল্য হিংসাকে হিংসা দ্বারা দূর করা যায় না, প্রয়োজন আছে। প্রেমের সন্ত্রাস ও সহিংসতায় লাভ হয় বিপক্ষের বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয় না তাতে। বরং ফল হয় বিপরীত। অনেক ক্ষেত্রে সাপ মারতে গিয়ে ছিপ ভেঙ্গে বসে থাকে। কখনো বা জলের ছিটা দিয়ে লগির গুঁতো’ খেতে হয়। কখনো হাত বোমা ছুঁড়ে মিহলের আঘাত খেতে হয়।

যৌবন-উন্মত্ত বন্ধু আমার দেহের শক্তিমত্তা নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করো না। কারণ মহান প্রতিপালক আল্লাহ অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর অহংকার হল সত্য প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে ঘৃণা করার নাম। অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার মাধ্যমে মানুষকে অহমিকা প্রদর্শন করো না। বংশ-গৌরব, জনশক্তি, ধনগর্ব, শিক্ষা ও জ্ঞানের আত্মসম্মতি, রূপ ও রঙের অহংকার, পদ ও গদির অহংকার প্রভৃতির প্রকাশ কোন সময়ই কোনভাবেই বৈধ নয়। অতএব ধর্মের নামে এ সবে অহমিকা প্রদর্শন যে তোমার জন্য আদৌ বৈধ নয়, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তুমি যদি তোমার ঐ উন্মত্ততা ও অহংকারের মাধ্যমে মানুষকে সর্বাসুন্দর দ্বীনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে তোল, তাহলে জেনে রেখো যে, মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধাদানকারীর মত বড় জালেম আর অন্য কেউ নেই।

ধর্মপ্রাণ যুবক বন্ধু! ধর্মীয় অনুভূতি অধিক জাগ্রত হলে জোশে নয়, বরং হুশ দ্বারা কাজ নিতে হবে। সুতরাং নিশ্চয়ই মশা মারতে কামান দাগা’ চলবে না। ধরে আনতে বললে, মেরে আনা’ অবশ্যই বৈধ হবে না। হজ্জ করতে গিয়ে কুরবানীর দিন তথা তার পরের আরো ৩ দিন পাথর মারার স্থানে পাথর মারতে হয়। কিন্তু আবেগবশে অনেকে যেন শয়তানকে সামনে পেয়ে জোশে ও রোষে নির্দিষ্ট। সংখ্যার অধিক অথবা নির্দিষ্ট সাইজের অধিক বড় পাথর মারে। কেউ কেউ পায়ের জুতা এবং মাথার ছাতাও ছুঁড়ে মারে। আর সেই সাথে অন্যান্য হাজীদের প্রতিও ‘যুদ্ধং দেহি’ ভাব দেখিয়ে কঠোরতা ও বলবত্তা প্রদর্শন করে থাকে।

অথচ কুরবানীর দিন পাথর মারার সময় মহানবী (সা.) পাথর কুড়াতে আদেশ দিলে সাহাবাগণ তাঁকে সাতটি

পাথর কুড়িয়ে দিলেন। তিনি বড় বড় পাথর না মারার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, “তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থাক। কারণ ঐ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে।” (আহমাদ ১/২১৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯ নং)

মামুলী ধরনের ছোটখাট ইজতেহাদী মসলা-মাসায়েল নিয়েও দ্বন্দের সাথে উগ্র মনোভাব। দেখা যায় বহু যুবকের। অন্ধ পক্ষপাতিত্ববশে প্রতিপক্ষের আলেম বা লোকেদেরকে পিটিয়ে দাও, মার ছাড়া ওষুধ নেই’ ইত্যাদি বলে অনেক সময় তা কাজেও পরিণত করা হয়। প্রতিপক্ষ হকপন্থী হলেও তা মানতে চায় না মারমূর্তি গর্বিত কিছু যুবক দল।

১৪১৮ হিজরী সনে বোম্বাই মাহিমের বেলালী মসজিদে একবার ইমামতি করতে গিয়ে মাগরিবের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা মাউন এবং পরের রাকআতে ভুলক্রমে সূরা ফীল পড়ে ফেলে নামায শেষ করেছি। সালাম ফিরতেই সকলে এক বাক্যে বলে উঠল, 'নামায নেহী হুই। দুহরাকে পঢ়া জায়ে!' আমি বললাম, মুসহাফের তরতীব অনুযায়ী কিরাআত জরুরী নয়। অতএব নামায শুদ্ধ। ইমাম সাহেব মেসহরের উপরে রাখা বেহেস্তী যেওর' নিয়ে খুলে এক জায়গায় পড়ে বললেন, 'আপকো সিজদায়ে সহ কর লেনা চাহিয়ে থা। ওয়াজিব ছুটনে সে সিজদায়ে সহ জরুরী হোতা হয়। আমি বললাম, মুসহাফের তরতীব অনুযায়ী সূরাগুলো নামাযে পাঠ করা যে ওয়াজিব, তা আগে প্রমাণ করুন, তবেই তো। যাই হোক, ইমাম সাহেব পরিশেষে মেনে নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কোয়ী বাত নেহী, নামায হো গয়ী হয়।

মসলাটির ব্যাপারে আমার ভিতরে এবং বাহ্যিক কথাবার্তায় এমন জোর ছিল যে, আমি। হেরে যাব বা আমি ভুল করেছি, তা আমি ভাবি ও প্রকাশ করিনি। কিন্তু কি যেন এক ভয়ে আমার জানটা টিপটিপ করছিল কতক উদীয়মান যুবকের ভাবমূর্তি ও ফিসফিসানি দেখে। অবশেষে সকলে প্রস্থান করলেও এক রাগমূর্তি যুবক ব্যাপারটা এত সহজে মানতে না পেরে আমাদের রুমে এল। আমার এক বন্ধু তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলে চোখ রাঙা করে হিরোর মত ঘুসি' দেখিয়ে বলে উঠল, 'তু কিয়া সমঝতা হয় বে! তু চুপ, অরনা মার দুঙ্গা!' অতঃপর কোন রকম তাকে সামলানো হয়েছিল। সশব্দে আমীন'-বিরোধী কোন মসজিদে জোরে আমীন' বললেও প্রায় ঐ একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বহু জায়গায়। এতে নাকি তাদের মসজিদ নাপাক হয়ে যায়। তাই জোরপূর্বক ধোয়াও করায় অনেক জায়গায়। আর এই রূপই ছোটখাট বহু মসলা-মাসায়েল নিয়ে দাঙ্গা বাধাতে চায় বহু সম্ভ্রাসমনা উগ্র যুবকদল। কাদা ছুড়াছুড়ি করে সেই নিয়ে গৃহদ্বন্দ্ব বাধায় এক শ্রেণীর বাতিল পন্থীও।

ইসলামের ভিতরেও নানা মত, নানা দ্বন্দ্ব। কিন্তু যুবক ও সত্যানুসন্ধানীরূপে তোমার কর্তব্য হল, ঠান্ডা মাথায় সত্য অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, “অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাগণকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর যা উত্তম তা গ্রহণ করে। ওরাই হল তারা, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং ওরাই হল জ্ঞানী লোক।” (সূরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত)

আর প্রিয় নবী (সা.) বলেন, “মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিলেও তুমি তোমার হৃদয়ের কাছেও ফতোয়া নাও।” (মিশকাত ২৭ ৭৪ নং) অর্থাৎ, বিতর্কিত বিষয়ে তোমার বিবেককেও জিজ্ঞাসা কর যে, কোন্ বা কার ফতোয়াটি সঠিক হতে পারে?

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ছাড়া সমস্ত রকমের অন্ধ-ভক্তি ও অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে প্রয়োজনে বিপক্ষের সাথে সৌজন্যমূলক তর্কে লিপ্ত হতে পার। কিন্তু তাতে গরম হয়ে মারামারি' কেন সৃষ্টি হবে? দলীল ও যুক্তির কাজ কি হাত বা লাঠি করতে পারবে? সংকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান কালেও হিকমত নিয়ে চলা জরুরী।

কারণ, “নিজেকে লাক্ষিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়। ক্ষমতার অধিক কষ্ট বরণ করা তার জন্য অনুচিত।” (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৭৭৯৭ নং)

অতএব কোন কুকাজ বন্ধ করার সময়ে যে পর্যায়ক্রম আছে তা পালনীয়। হাত ও ক্ষমতা দ্বারা না পারলে মুখ দ্বারা, হিকমতের সাথে উপদেশ দ্বারা কুকাজ বন্ধ কর। তাতে সমর্থ না। হলে, সেখানে তোমার অপমান হওয়া বা জীবন যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে অথবা ঐ পাপের চাইতে বড় পাপ সংঘটিত হওয়ার ভয় থাকলে, সে ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বল বা বক্তৃতা প্রয়োগ করতে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। যেমন গান-বাজনা বন্ধ করতে গিয়ে যদি খুনাখুনির আশঙ্কা থাকে, তাহলে অবশ্যই গান-বাজনা থেকে বড় পাপ হল খুন-দাঙ্গা। অতএব তাতে বাধা দিতে যাওয়া তোমার আদৌ উচিত নয়। নচেৎ, তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও হবে আরো গুরুতর।

পক্ষান্তরে যেখানে প্রাণ হত্যার অনুমোদন বা আদেশ আছে, সেখানেও যে কেউ সেই দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ, শাসন কর্তৃপক্ষ (সরকার) ছাড়া সে ‘দন্ড’ কার্যকর করতে রয়েছে বিপরীত ফল।

তাছাড়া কোন মুসলিম যদি অসৎ কাজ করে, তবে তা দেখেই তাকে কাফের বলে আখ্যায়ন করা বৈধ নয়। বৈধ নয় তার সাথে কাফের’ মনে করে ব্যবহার। কারণ, কোন মুসলিমকে কাফের বলার ব্যাপার ততটা সহজ নয়, যতটা সহজে মানুষ তার বিষ-জিভ প্রয়োগ করে থাকে। কেন না, সে প্রকৃতপক্ষে কাফের না হলে, বক্তা নিজে কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, কাফের জ্ঞান করেই কোন মুসলিম ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আদৌ বৈধ নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, তথাকথিত বহু ইসলামী চিন্তাবিদই ইসলামে মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। যার ফলে আজ ইসলামের আসল রূপ চাপা পড়ে বহু মানুষ এ দ্বীনকে সন্ত্রাসের দ্বীন বলে মনে করে। এই মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের প্রারম্ভেই সাহাবাবর্গের প্রতি। ইসলামের নামে ইসলামের দুশমন ও মুনাফিকরা উক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে ঘটিয়েছে কত অশুভ ও অবাঞ্ছিত সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধ। শহীদ হয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রাঃ), তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী শও।

হযরত আলী সকে এক অতিরঞ্জনকারী দল ভক্তির আতিশয্যে নিজেদের ইলাহ’ (উপাস্য) মেনে নিয়েছিল। অপর দিকে আর একটি দল নিজেদের অতিরঞ্জিত দ্বীনদারীর ফলশ্রুতিতে তাকে কাফের’ মনে করে বসেছিল! উক্ত দলটির ব্যাপারে মহানবী (সা.) অহীলন্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, “অচিরেই শেষ যামানায় একটি নির্বোধ যুবদল হবে, যারা লোক সমাজে সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। কিন্তু ঈমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তারা কিয়ামতে পুরস্কৃত হবে।” (বুখারী ৩৬৫৪, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৩৫ নং)।

এই দল হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের যে তিনটি সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল হযরত ইবনে আব্বাস তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলে তাদের মধ্যে চার হাজার লোক হক পথে ফিরে আসে। অবশিষ্ট লোকেরা যুদ্ধ বরণ করে নেয় এবং আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অনেকে প্রাণ হারায়।

মহানবী বলেন, “যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে। যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ

পক্ষপাতিত্ব বা গোড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহ্বান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তি ও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।” (মুসলিম ১৮৪৮ নং)।

বর্তমান বিশ্বেও বহু চিন্তাবিদ রয়েছেন যাদের কলমের খোঁচায় অথবা বক্তৃতার ফিকিতে এমন মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে আছে, যার ফলে মৃত সাহাবাদের কবর উড়িয়ে দিতে এবং বহু ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে সন্ত্রাসীরা আনন্দবোধ করবে; বরং এতে আল্লাহর নিকট বৃহৎ প্রতিদানের আশাও করবে।

এই তো সেদিনকার কথা। এক উগ্র যুবক একজন দ্বীনের হকপন্থী আলেমকে তার বাসাতে প্রবেশ করে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর ‘শহীদ’ (?) হওয়ার আশায় পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করে তাকেও হত্যা করে দিতে বলে। কারণ, কোন সন্ত্রাসী জামাআতের এই শিক্ষা ছিল যে, একজন ওয়াহাবীকে খুন করতে পারলে বা তার হাতে খুন হতে পারলে জান্নাতী ও শহীদ হওয়া যায়।

সন্ত্রাসকে এমনভাবে সুশোভিত করা হয় যে, যুবক তা বুঝে উঠতে না পেরে शामिल হয়ে যায় সেই দলে ইসলামের খাতিরে। অথচ সে পথ যে, ইসলামকে রক্ষা করার পথ নয়; বরং তা আরো ধ্বংস করার পথ তা বিভিন্ন আড়ম্বরের ফলে বুঝে উঠতে পারে না। বলা বাহুল্য ইসলাম সন্ত্রাস থেকে বহু দূরে। সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যদি কোন মুসলিম ধর্মের নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে থাকে, তাহলে এ কথা মানতেই হবে যে, সে সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত এবং সালাফী চিন্তাধারা ও দাওয়াতপদ্ধতি হতে বহু দূরে অবস্থিত।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12495>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন